"নিরামিষ ভোজনের কারণ ব্যাখ্যা"

বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা: পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হতে হাজার হাজার কোটি বছর পর পর্যন্ত উত্তপ্ত অগ্নি পিন্ডের ন্যায় গ্যাসীয় বা বায়বীয় পদার্থের পৃথিবী ক্রমে ক্রমে শীতল হতে শীতলতর হয়ে তরলে পরিণত হলো। আরো বহু কোটি বছর পর তরল পৃথিবী, বর্তমান কঠিন গোলাকার পৃথিবীর রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর আকাশ ছিল বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থে ভরপুর। ঘন ঘন ভুমি কম্পন, অগ্নেয়গিরির অগ্নুতপাত, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির আকর্ষণ-বিকর্ষণ ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ইত্যাদি সৃষ্টি হলো। তবে সৃষ্টির আদিকালে এগুলোতে কোন পানি ছিল না। এগুলো ছিল শুন্য বা খালি অবস্থায়।

আরো বহু কোটি বছর পর তাপমাত্রা হ্রাস ও আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ভূমির সংলগ্ন বায়বীয় অঞ্চলে জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হতে লাগলো। জলীয়বাষ্প ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে মেঘ সৃষ্টি হলো। উক্ত মেঘ একত্রে জমে আবহাওয়াগত কারণে বৃষ্টিপাত শুরু হলো। এভাবে বৃষ্টির জলে সকল সমুদ্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী ইত্যাদি জলে পরিপূর্ণ হলো। স্রষ্টার অপার কৃপায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হলো, যাতে জলে এককোষী শেওলা সৃষ্টি হতে লাগলো। অতঃপর বিবর্তন ও অনুকুল পরিবেশে বহুকোষী ও জটিল জৈব অনু সৃষ্টি হতে লাগলো। এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ বছর পর বিবর্তনের ধারায় জৈব অনু হতে বহুকোষী উদ্ভিদ, গাছপালা, তরুলতা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে লাগলো। এভাবে কেটে গেলো বহু বছর।

অতঃপর উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে নতুন পরিবেশে গাছে ফল-ফুল দ্বারা পৃথিবী সজ্জিত হলো। একই সাথে প্রাণী বা জীব সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলো। জীব সৃষ্টির এ উত্তম পরিবেশে এককোষী প্রাণী এবং ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে জটিল জৈবঅনু বিশিষ্ট প্রাণী ও জীব সৃষ্টি হতে লাগলো।

তারও বহু বছর বা লক্ষ লক্ষ বছর পর স্রষ্টার কৃপায় তিনি নিজে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) কে প্রেরণ করেন। স্রষ্টার ইচ্ছায়ই মানবসহ চৌরাশি লক্ষ প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

পুনঃজন্ম ও জন্মান্তরবাদ নীতি অনুযায়ী পৃথিবীতে মানবাত্মা সমূহ জন্মচক্র অনুসারে বিভিন্ন জীবে জন্ম নিয়ে ভ্রমন শুরু হলো।

প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) এর খাদ্য শুরু হয় ফলমূল, উদ্ভিদ ইত্যাদি দ্বারা।

সুতরাং, এ সময় হতে মানব খাদ্য ফলমূল, শাকসবজি বা নিরামিষ দ্বারাই শুরু হয়। আগুন দিয়ে মাছ মাংস রান্না করতঃ খাবার ব্যবস্থাপনা আদি মানবগোষ্ঠী জানতেন না এবং ইহার কোন প্রয়োজনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ তৃণভোজী হিসেবেই ছিল।

স্রষ্টার দেয়া আদি খাদ্যই ছিল ফলমূল, তৃনলতা, বীজ ইত্যাদি অর্থাৎ মানবের আদি খাদ্য ছিল নিরামিষ, সুতরাং আধ্যাত্মিকভাবে নিরামিষই মানবের জন্য নির্ধারিত আদর্শ খাদ্য।

মাতৃশিশু জন্ম হওয়ার পূর্বেই যেমন স্রষ্টা শিশুর মায়ের স্তনে শিশু খাদ্য হিসেবে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, ঠিক তেমনি মানব সৃষ্টি করার পূর্বেও তাঁর খাদ্য হিসেবে মাতারূপী বসুন্ধরা (মাটিময় পৃথিবী) উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন।

প্রাণী বা জীব সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগত বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তা হলে, ***প্রাণীর জন্যই (মানবসহ) প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতির জন্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়নি।*** তাই, মহাবিশ্বের মধ্যে প্রাণীই স্রষ্টার সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। আরো দেখা যাচ্ছে যে, প্রাকৃতিক সকল শক্তি বা ক্ষমতাই প্রাণীর সেবায়

নিয়েজিত। সেজন্যে প্রাণীই হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তাই, প্রাণীকে হত্যা করতঃ ভক্ষন করা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও নিষ্ঠুর কর্ম। যা স্রষ্টার জন্য প্রিয় তা মানবের জন্যও প্রিয় হওয়া উচিৎ।

আর সে জন্যই জীবে দয়া প্রদর্শন করার এক মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে মহাগুরু রমিজের অনুসারীগণ মাছ-মাংস–ডিম ভক্ষন না করে নিরামিষ ভোজী হয়ে থাকেন। মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা (আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত)। মানুষের মস্তিস্ক অন্য প্রাণী হতে অনেক উন্নত। মানব মস্তিস্কের অভিনব গঠন, দেহের গঠন, তার দেহের হরমোন এবং এমন কিছু জৈব বস্তু আছে যে কারণে তার আচরণ সকল পশু হতে উন্নততম। মানবের মানবীয় আচরণ নিজগৃহ থেকে সর্বত্র কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

পক্ষান্তরে পশুর পাশবিক স্বভাব হল হিংস্রতা। এই হিংস্র স্বভাবের জন্যই পশু নিকৃষ্ট প্রাণী বা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। পশুর এ হিংস্র স্বভাবের জন্য নিশ্চয়ই তার দেহে ও তার মস্তিস্কে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যার কারণে ইহার দেহ ও আচরণ হিংস্র স্বভাব দ্বারা গঠিত হয়েছে। এ সমস্ত উপাদানের উপস্থিতিতে ইহাদের স্বভাব ও আচরণ হিংস্র বা উগ্র হয়ে থাকে।

পশুর মাংস ভক্ষন করলে পশুদের পশুত্ব বা হিংস্র স্বভাবের জন্য কার্যকর যে সমস্ত উপাদান ইহাদের দেহে ও মস্তিস্কে বিদ্যমান আছে ঐ সমস্ত উপাদানগুলো যিনি পশু মাংস ভক্ষন করবেন তার দেহে সংক্রমিত হবে বা উল্লিখিত উপাদানগুলো তার দেহে দেহান্তরিত হবে। ইহার ফলশ্রুতিতে যিনি মাংস ভক্ষনকারী তার আত্মা ও মস্তিস্ক ক্রমে ক্রমে পাশবিক স্বভাবে পরিণত হবে। তার মানবিক আচরণ (Humanity) হ্রাস পাবে এবং পাশবিক আচরণ (Animaliuty) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে মানবাত্মার স্বভাব ক্রমান্বয়ে পশু আত্মার স্বভাবে রূপান্তরিত হবে। জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী উক্ত পশুর আচরণে পরিণত

পাশবিক আত্মা, মানবের আত্মা হয়েও পরজন্মে পশুতে জন্ম ধারণ করতে হবে এবং জীব হত্যার কর্মফল ভোগতে হবে।

উক্ত কারণেই মহাগুরু রমিজ নিরামিষভোজী ছিলেন এবং তাঁর অনুসারী সবাই নিরামিষভোজী।

এই নিরামিষ ভোজনের প্রেক্ষিতে মহাগুরু রমিজ তাঁর উক্ত বলিষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করতেন। অধ্যাত্ম বিষয়ে তিনি কোন সময়ও গোরামী বা অন্ধ বিশ্বাসকে পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে যুক্তি নির্ভর তত্ত্বকেই তিনি বেশী মূল্যায়ন করতেন। কারণ, বর্তমান সময়ে বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী মানুষের চিন্তা-চেতনা মহাকালের পালাবদলের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। এককালে গুহায়-জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষ সভ্যতার বিকাশের ধারায় আজকের দিনে পৃথিবীর গন্ডি অতিক্রম করে মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। ফলে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত বিভিন্ন ধর্ম ও পথের মানুষ অন্য সব বিষয়ের মত ধর্ম ও পথ গুলোকে নিছক অন্ধ বিশ্বাসের বিষয়বস্তু হিসেবে মেনে নিতে রাজি নয়, বরং তারা চায় এর যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা। তাই মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"সাইন্টিস্ট দেখিয়া নেয় কোথায় কি রয়েছে,

তোমরা প্রমাণ কর স্রষ্টা কোথায় আছে"।

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আপ্তবাক্যে গুরু রমিজ বলেন- বিজ্ঞানীরা যেমন মহাবিশ্বের কোথায় কি রয়েছে তা আবিষ্কার করতে বা উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট আছে, তদ্রুপ যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে গবেষণায় আছেন তাদেরকে স্রষ্টার অবস্থান কোথায়, তার স্বরুপ কি, তাকে কিভাবে চেনা যায়, কি ভাবে তার নৈকট্য লাভ করা যায় তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার জন্য রমিজ পন্থীদেরকে আহ্‌বান ও আদেশ করেছেন। স্রষ্টা সর্বজীবে বিরাজমানও ইহা গুরু রমিজের মতবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে মানবাত্মাসহ সকল জীবের আত্মা স্রষ্টার মূলসত্ত্বা বা আদি-

আত্মা হতে সৃষ্ট। যে সমস্ত মানুষ ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় জ্ঞান ও বিবেককে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে বিবেক বর্জিত যথেচ্ছাচারভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং বিকৃত জ্ঞানকে পাশবিক ও অমানবিক কাজে ব্যবহার করেছে তারই ফলশ্রুতিতে, তাঁরা মানুষ হয়েও যে সমস্ত পশু সুলভ আচরণ করেছে ঐ সমস্ত পশুর আকার ধারণ করতঃ পুনঃজন্ম নিয়েছে।

সুতরাং, আমাদের চারদিকে বর্তমানে যে সমস্ত পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণী দেখছি তা সবই এক পরমাত্মা বা স্রষ্টার জাত। কর্ম অনুযায়ী তারা বিভিন্ন প্রাণী বা জীবে থেকে কর্ম ফল ভোগছে। মানবের ক্বাল্‌ব বা হৃদয়ে স্রষ্টা বাস করেন। তা হলে আপাতত পশু আকারের মানবগুলোর হৃদয়েও স্রষ্টা বাস করেন। তার মানে স্রষ্টা সকল জীবের মধ্যেই আছেন।

সুতরাং, সকল প্রাণী বা জীবকে ভালোবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো।

মূল কথা হচ্ছে, স্রষ্টাকে ভালোবাসতে হলে তার সৃষ্ট সর্বজীবকে ভাল বাসতে হবে। আর একারণেই জীব হত্যা করতঃ তার মাংস ভক্ষন না করে, স্রষ্টার প্রেমে মগ্ন হয়ে নিরামিষ ভোজন করতঃ আজীবন সংযম পালন করা হয়। মানবসহ সর্বজীব স্রষ্টার অতি উত্তম সৃষ্টি (আশ্‌রাফুল মাখ্‌লুকাত্)।

পবিত্র হাদীসে সকল মানুষ ও সর্বজীবকে দয়া প্রদর্শনের কথা উল্লেখ আছে।

ইসলাম ধর্ম শিক্ষাগু১৯৯৬ নবম দশম শ্রেণী- হাদীস নং-০৬।

বর্ণিত আছে যে ***"সকল সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র আপনজন। অতএব, তিনিই স্রষ্টার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন"।***

অর্থ- *যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন আল্লাহ্‌ও তাঁহার প্রতি দয়া করেন।*

এ হাদীসে পরোক্ষভাবে জীব বা প্রাণী হত্যা নিষেধ করারই সামিল ।

সহীহ্ বোখারী শরীফ- (সকল খণ্ড একত্রে)
প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ জুবায়েদ তালুকদার (জনি)
প্রকাশকাল ঃ ২০০৫ জুলাই ১ম মুদ্রণ

১২৮৪ । হাদীস ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ জনৈক ব্যাভিচারিনীকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে, একদিন সে একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল । দেখল কুকুরটি একটি কুপের পাশে বসে হাপাচ্ছে । বর্ণনাকারী বলেন, পানির পিপাসায় তাকে মৃত প্রায় করে দিয়েছিল । তখন ব্যাভিচারিনী মহিলাটি তার মোজা খুলে ওড়নার সাথে বাঁধল তার পর সে কুফ হতে পানি তুলে কুকুরটিকে পানি পান করাল । এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো ।

একটি প্রাণীকে মৃত্যুর পথ হতে জীবনে বাঁচানো হয়েছে বলে প্রাণ রক্ষাকারী ব্যাভিচারিনী মহিলা যদি তার পাপ হতে মুক্তি পায় তবে আজীবন প্রাণী হত্যা না করে নিরামিষ ভোজন করতঃ লক্ষ লক্ষ জীবকে যিনি হত্যা হতে রক্ষা করবেন তিনি অবশ্যই স্রষ্টার নিকট হতে তাঁর দয়া বা কৃপা পাবেন এবং পাপমুক্ত হবেন বলে উক্ত হাদীসে প্রতীয়মান হয় ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- ***"বহুরূপে ছাড়ি কোথা খুঁজেছ ঈশ্বর***
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" ।

এখানেও স্বামী বিবেকানন্দ সর্বজীবেই স্রষ্টা বিরাজিত এবং জীবের মাঝেই শিবকে বা স্রষ্টাকে পাওয়া যাবে বলে বিবৃত আছে ।

স্রষ্টার সৃষ্ট যত প্রাণী আছে তাদেরকে ভালোবাসলেই স্রষ্টাকে ভালবাসা হলো । তাতেই স্রষ্টা দয়াবান হবেন ।

মহাগুরু রমিজ স্রষ্টাকে ভালোবাসা ও তাঁর জাতের সঙ্গে মিশে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন *"তোমরা সর্বজীবকে ভালোবাসতে পারলেই স্রষ্টাকে ভালোবাসা হলো। স্রষ্টার সাথে প্রেম করা আর তাঁর সৃষ্ট সকল প্রাণী এবং অন্যান্য সৃষ্টির সাথে প্রেম করা একই জিনিস"* তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

১. *মানবকে ভালবাস হৃদয়ে রাখি ভক্তি*
মানবেতে আছেন প্রভু তাঁরে জানাও স্তুতি।

২. *যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট*
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্বজীবে রাষ্ট্র।

৩. *প্রতিবেশীর প্রতি কর ভাল ব্যবহার*
বিপদে সম্পদে তাদের করিও উদ্ধার।

৪. *কর্মফল বিশ্বমাঝে যদি হয় সত্য*
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত।

বিঃ দ্রঃ জীবে দয়া বিষয়টি নিরামিষ ভোজনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সে জন্যই উক্ত আপ্তবাক্যগুলোতে মহাগুরু রমিজ সকল মানুষকে ভালবাসার কথা, কোন জীব বা মানুষ কারো হাতে বা মুখের বাক্যে যেন কষ্ট না পায় তার কথা, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার কথা এবং সব শেষে জীবে দয়া না থাকিলে কেহ মুক্ত হতে পারবেন না বলে তাঁর পন্থীদের এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশগুলো দিয়েছেন।

নিরামিষ ভোজনের সাথে অধ্যাত্মবাদের একটি অনন্য সম্পর্ক রয়েছে বিধায় মহাগুরু রমিজ তাঁর বিধানে নিরামিষ ভোজনকে একটি অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাই তাঁর অনুসারী সকলেই নিরামিষভোজী।